OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 45
Website: https://tirj.org.in, Page No. 395 - 409
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 395 - 409
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

বাংলার প্রকৃতি রূপায়ণে আল মাহমুদের কবিতা

ড. ফজলুল হক তুহিন
সহকারি অধ্যাপক, ডেমনস্ট্রেশন ইউনিট
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ
Email ID : dr.fhtuhin@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Nature, Al Mahmud, Poetry, Aesthetic, Philosophy, Rivers, Rain, Soil, Jibanananda Das, Jasimuddin.

Abstract
The flow of portraying Nature with delight and fascination has been running for long days in Bengali poetry. Al Mahmud, one of the greatest poets of Bangladesdh, portrayed the real and independent picture of Nature. He portrayed the aesthetic, philosophical, social and political identities, firstly, in the total perspectives of Nature and secondly, in the imageries of different components of Nature—rivers, rain and soil. The sectors he was devoted to are the novel world created in the relentless flow of the Padma, the Meghna and the Jamuna and the ancient destroying Nature of Bengal. The Nature portrayed in Jibanananda's and Jasimuddin's poetry is quite different from that of Al Mahmud. The poet's adolescence was passed during the British imperialistic rule, riot, violence, the Second World War, Bengal Division, and Famine. He did not behold the Bangladesh of Jibananda and Jasimuddin. That is why, he cannot call his country the 'golden Bangladesh because he saw the Bangladesh breaking the banks of rivers. The distinct shape of Al Mahmud's philosophy of Nature in depicting the Bengal replete with breakage has been revealed in this essay.

Discussion

ভূমিকা : প্রকৃতি জীবন ও প্রাণের উৎস ও আশ্রয়। মানুষের অস্তিত্বের সূচনা থেকে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য এবং জীবন ও জীবিকার সম্পর্ক ওতপ্রোত। উৎপাদন ব্যবস্থা, মানুষের জীবনধারণ, বিবর্তন, আর্থিক ভিত্তি নির্মাণ, সমাজ কাঠামো, পারস্পরিক লেনদেন, প্রাণ ও পরিবেশ, ইতিহাস, সংস্কৃতি ও সভ্যতার মৌল উপাদান ও ভিত্তিতে প্রকৃতি অন্যতম প্রধান ভূমিকা রাখে। প্রকৃতি ব্যক্তিমানুষ ও সংস্কৃতির বহুবিধ নির্মাণ ও অভিব্যক্তির আধার। দৃষ্টিপথের ভূদৃশ্য, আবাদ ও জীবিকার ক্ষেত্র, রাজনীতির জায়গা, জাতির ভূখণ্ড, ধর্মের পুণ্যভূমি, পর্যটনের কেন্দ্র, সাহিত্যের উপাদান, চিত্রকলার মটিফ, অলঙ্করণের কৌশল, নৈতিকতার মানদণ্ড বা আচরণের নির্দেশক হিসেবে প্রকৃতির উপস্থাপন ও উদ্ভাসন অনেক মানবীয় কর্মকাণ্ডের কয়েকটি দিক। মননচর্চা থেকে শুরু করে জীবিকার বিরাট আয়তনে প্রকৃতি সব সময় তার প্রাকৃতিকতা ও বস্তুময়তা দিয়ে সফলতা-বিফলতা পরিমাপে সাহায্য করে। ফলে শিল্পে, বক্তব্যে, লিখনে, পাঠ্যে ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে প্রকৃতির ঋণ অনস্বীকার্য। দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং রাজনীতিতে প্রকৃতির প্রসঙ্গ সংকট ও সমাধানের বিষয় হয়ে দেখা দেয়।[১]

মানুষ তাই প্রকৃতি ও সংস্কৃতির সন্তানরূপে বিরাজমান। তবে মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি, দর্শন, লক্ষ্য, সৌন্দর্যবোধ, মূল্যবোধ, নৈতিকতাবোধের নির্মাণে প্রকৃতির অবদান স্বীকার করেও বলা যায়, সৃষ্টিশীলতার পরিবর্তন, মতাদর্শের মেরুকরণ প্রকৃতি-মূল্যায়নে স্থিরতা দেয়নি। বিভিন্ন সময়ে তার পরিবর্তন হয়েছে নানাভাবে। জীবনাচরণে-শিল্পে-সাহিত্যে তাই প্রকৃতির উপস্থিতি অনিবার্য।

গবেষণা পদ্ধতি ও প্রয়োজনীয়তা : সাহিত্য বিচারের বা গবেষণার বিভিন্ন রীতি-পদ্ধতি প্রচলিত আছে। বিশেষভাবে কবিতা বিচারে একটিমাত্র পদ্ধতির অবলম্বন যথেষ্ট নয়। সেজন্য আল মাহমুদের কবিতার বিচার-বিশ্লেষণে কয়েকটি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে - ঐতিহাসিক পদ্ধতি (Historical Method), বর্ণনামূলক পদ্ধতি (Descriptive Method), পাঠ-বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Content Method) ও তুলনামূলক পদ্ধতি (Comparative Method)। এইসব রীতি-পদ্ধতির সমন্বয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ বিচারের চেষ্টা করা হয়েছে।

আধুনিক কবিতায় প্রকৃতি দেখার বিচিত্রতা পরিলক্ষিত। ঔপনিবেশিক আমল থেকে বাংলাদেশ পর্বে এই দৃষ্টির রূপান্তর দৃশ্যমান। বাস্তব ও নান্দনিক উভয় ভঙ্গিতে কবিতায় প্রকৃতি রূপায়ণের ক্ষেত্রে কবি আল মাহমুদের কবিতার পথ বিবেচনার দাবি রাখে। কবিকৃতি ও স্বাতন্ত্র্য নির্ণয়ে বাংলার প্রকৃতি অঙ্কনে তাঁর বিশেষত্ব অনুসন্ধান একান্ত প্রয়োজন।

কবিতায় প্রকৃতির রূপায়ণ : সৃষ্টিশীল ও সংবেদনশীল মানুষ হিসেবে একজন কবির সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক আরো ব্যাপক ও গভীর। সেজন্যে কবির সৃষ্টিকর্মে প্রকৃতির সামগ্রিক রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-স্বাদের রূপকল্প বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। এক অর্থে কবিকে প্রকৃতির সাধক বলা হয়ে থাকে। কারণ কবিতা সৃজনে প্রেরণা ও ক্ষেত্র হিসেবে প্রকৃতি ও প্রকৃতিলগ্নতা কাজ করে। কোনো কোনো কবিকে ‘প্রকৃতির কবি’ও বলা হয়। যেমন ইংরেজি সাহিত্যে ওয়ার্ডওয়ার্থ (১৭৭০-১৮৫০) ‘প্রকৃতির কবি’ হিসেবে চিহ্নিত। কেননা তাঁর কবিতায় সমগ্র জীবনানুভব প্রকৃতিকে অবলম্বন করে সম্পন্ন হয়েছে এবং প্রকৃতির জীবন্ত ও আন্তরিক রূপ অন্যদের চেয়ে তাঁর কবিতায় অনেক বেশি প্রকাশিত।

বাংলা কবিতা প্রাচীনকাল থেকেই প্রকৃতিলগ্ন। ‘চর্যাপদে’র অধিকাংশ পঙক্তিই প্রকৃতি আশ্রিত। মধ্যযুগের বিশাল কাব্যজগৎ প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। আধুনিককালে প্রকৃতির সবচেয়ে বড় প্রকাশ ঘটেছে রবীন্দ্রসাহিত্যে। তাঁর কবিতার প্রধান বিষয় প্রকৃতি। তাঁর অধিকাংশ কবিতা ও গান সরাসরি ঋতুসংক্রান্ত। তাছাড়া তাঁর ‘জীবনদেবতা’র উপলব্ধিও মুখ্যত প্রকৃতির ভিতর দিয়ে হয়েছে। এসব কারণে বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-৭৪) বাংলা সাহিত্যের কবিদের মধ্যে তাকেই ‘প্রকৃতির কবি’ হিসেবে প্রধান বলেছেন। এরপর বিশেষ অর্থে ‘প্রকৃতির কবি’ বলেছেন জীবনানন্দ দাশকে (১৮৯৯-১৯৫৬)।[২] কারণ এ-জাতীয় কবি সমগ্র জীবনকে প্রকৃতির ভিতর দিয়ে গ্রহণ ও প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রযুগে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২), কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬), যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫৪), মোহিতলার মজুমদারের (১৮৮৮-১৯৫২) কবিতায় প্রকৃতির উপস্থিতি আপনাপন ভঙ্গিতে অঙ্কিত। অন্যদিকে ‘পল্লীকবি’ হিসেবে খ্যাত কবিদের কাব্যে প্রকৃতির রঙ-রেখা-রূপ সামগ্রিক রূপকল্পে বর্ণিলরূপে চিত্রিত। বিশেষভাবে জসীমউদ্দীনের (১৯০৩-৭৬) কবিতায় প্রকৃতি ও প্রকৃতি আশ্রিত বাস্তব জীবনের শিল্পমণ্ডিত প্রকাশ উল্লেখযোগ্য। তাঁর আঁকা প্রকৃতির সঙ্গে তিরিশোত্তর আধুনিক কবিগোষ্ঠীর অঙ্কিত প্রকৃতির সাদৃশ্য নেই। কেননা তিরিশোত্তর কবিরা প্রকৃতিকে নান্দনিক উৎস হিসেবে গ্রহণ করেন; কিন্তু জসীমউদ্দীন প্রকৃতি বলতে সৌন্দর্য সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে জীবন-জীবিকার বাস্তব ক্ষেত্ররূপে গ্রহণ করেন।

নিসর্গ সম্বন্ধে ব্রিটিশ মতাদর্শ উপনিবেশিক বাংলায় অবিকল কাজ করেনি। বাংলার কিংবা বাংলাদেশের ইতিহাসে দুটি উপনিবেশিক কালের নির্দিষ্টতা আছে - প্রথমটি ব্রিটিশ, দ্বিতীয়টি পাকিস্তানী। সেজন্য ব্রিটেনের বিবর্তিত ইতিহাস এক্ষেত্রে কার্যকর নয়। উপনিবেশিক বাংলায় প্রকৃতির দুই স্বরূপই ক্রিয়াশীল। একটি হচ্ছে নৈতিক-নান্দনিক; অপরটি হচ্ছে অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক। উপনিবেশিককালে শ্রেষ্ঠ নান্দনিক রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে দুই স্বরূপই কাজ করেছে; কিন্তু অধিকতর ক্ষমতা লাভ করেছে প্রথম স্বরূপটি। তিনি প্রকৃতিকে নীতিসম্পন্ন ও কামনাময় করেছেন, তার মধ্যে পুরাণকল্পের শক্তি খুঁজে পেয়েছেন এবং একই সঙ্গে বাস্তব অতিক্রমী বোধ যুক্ত করেছেন। এই প্রক্রিয়ায় তিনি প্রকৃতির মধ্যে নান্দনিক এক

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 45
Website: https://tirj.org.in, Page No. 395 - 409
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বোধ আবিষ্কার করেছেন।[৩] কিন্তু বাংলায় তিনি প্রকৃতি ভয়ঙ্করভাবে সামাজিক এবং বাস্তব, জমি হচ্ছে ভাড়া খাটানোর বিষয়, ঋণগ্রস্ত হওয়ার ইতিহাস, ধান-পাট উৎপাদনের ক্ষেত্র এবং ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হওয়ার প্রক্রিয়া। সেজন্য রবীন্দ্রনাথের নান্দনিকতা কিংবা নিসর্গ থেকে উৎসারিত নান্দনিকতার প্রভাব ক্ষীণ হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে প্রকৃতির নান্দনিক আদর্শায়িতকরণের সঙ্গে তাঁর সমাজবোধের দ্বন্দ্ব উপেক্ষা করার নয়। তিরিশের দশকে, সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের উত্থানপর্বে তাঁর নান্দনিক বোধ কিংবা সাংস্কৃতিক বোধ প্রশ্নের মুখোমুখি হয়; বিপরীতে শক্তিশালী হয়ে ওঠে সংস্কৃতির সমাজবোধ। এই বোধটাই চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে জয়নুল আবেদীন (১৯১৪-৭৬), এস. এম. সুলতান (১৯২৩-৯৪) এবং কামরুল হাসানের (১৯২১-৮৮) কাজে সোচ্চার হয়েছে। কবিতায় জসীমউদ্দীন ও আল মাহমুদের কৃতিতে ব্যঞ্জনা লাভ করেছে।

আল মাহমুদের প্রকৃতি-দৃষ্টি : বায়ান্নর ভাষা-আন্দোলনোত্তর কালে বাংলাদেশের কবিতায় প্রকৃতির বিবিধ রূপ-রঙ-স্বাদ নানা আঙ্গিকে কাজ করেছে। বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান কবি আল মাহমুদের (১৯৩৬-২০১৯) কাব্যযাত্রা আজীবন প্রকৃতির মধ্য দিয়ে। একদিকে প্রকৃতির প্রাণ-চাঞ্চল্য, সৌন্দর্য, বিশালতা, বর্ণবৈভব অর্থাৎ নান্দনিক রূপ; অন্যদিকে প্রকৃতি জীবন-জীবিকার অবলম্বন, ধ্বংসাত্মক হিংস্রতা বা বাস্তবরূপে বিরাজমান। এই দুই রূপ তাঁর কাব্যে বিশেষ ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। কারণ কবির প্রধান বিষয় নারী; তারপরেই প্রকৃতি। কবির ভাষায় -

> "আমার কবিতার আরেক প্রধান বিষয় হল প্রকৃতি। আমি নিসর্গরাজি অর্থাৎ প্রকৃতির মধ্যে এমন একটা সংগুপ্ত প্রেমের মঙ্গলময় ষড়যন্ত্র দেখতে পাই যা আমাকে জগৎ রহস্যের কার্যকারণের কথা ভাবায়। এক ঝাঁক পাখি যখন গাছ থেকে গাছে লাফিয়ে বেড়ায়, মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে পতঙ্গ ও পিঁপড়ের সারি আর মৌমাছিরা ফুল থেকে ফুলে মধু শুষে ফিরতে থাকে আমি তখন শুধু এই আয়োজনকে সুন্দরই বলি না বরং অন্তরালবর্তী এক গভীর প্রেমময় রমণ ও প্রজননক্রিয়ার নিঃশব্দ উত্তেজনা দেখে পুলকে শিহরিত হই। মনে আদিম মানুষের মত অতিশয় প্রাথমিক এক দার্শনিক জিজ্ঞাসা জাগে- কে তুমি আয়োজক? তুমিও কবি? না কবিরও নির্মাতা? তবে তুমি যে অনিঃশেষ সুন্দর আমি তার সাক্ষ্য দিচ্ছি। আমার সাক্ষ্য গ্রহণ করো প্রভু।"[৪]

সমুদ্র, পর্বতচূড়া, দিগন্ত বিস্তৃত প্রান্তর, নৈসর্গিক দৃশ্য, নদী অর্থাৎ ভৌগোলিক বিচরণক্ষেত্র কবিকে যেমন অভিভূত করে; তেমনি প্রকৃতির বাস্তবতাও তাকে সমানভাবে ভাবায়। তবে এই প্রকৃতি পশ্চিম বাংলার নয়, পূর্ব-বাংলার। হুমায়ুন কবির (১৯০৬-১৯৬৯) নির্দেশিত পদ্মা-মেঘনা-যমুনার অবিরাম স্রোতধারায় নতুন জগতের সৃষ্টি ও পুরাতনের ধ্বংসময় পূর্ব-বাংলার৫ প্রকৃতি তাঁর আরাধ্য। আবার জীবনানন্দ দাশ ও জসীমউদ্দীনের কবিতায় অঙ্কিত প্রকৃতি আর আল মাহমুদের প্রকৃতি একরূপ নয়। কারণ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দেশভাগ, দুর্ভিক্ষের সময় কবির কৈশোর কেটেছে। জীবনানন্দের ও জসীমউদ্দীনের বাংলাদেশ তিনি দেখেননি; সেজন্যে এ দেশকে কবি 'সোনার বাংলাদেশ' বলতে পারেন না। কেননা তিনি 'নদীর পাড়ভাঙা বাংলাদেশ' দেখছেন -

> "আমি এমন এক গ্রাম বাংলাকে উপস্থাপন করতে চেয়েছি, যে গ্রামবাংলা ভেঙে পড়া। ঠিক জসীম উদ্দীনের বাংলাদেশেও না। আবার জীবনানন্দ দাশের বাংলাদেশও না। জসীমউদ্দীন এবং জীবনানন্দ দাশের বাংলাদেশে এক ধরনের রূপকথা আছে। একটা স্বপ্ন আছে। কিন্তু আমার দেখা বাংলাদেশ একদমই রূঢ়। এ বাংলাদেশ নদীর পাড়ভাঙা বাংলাদেশ। গ্রামকে গ্রাম বিলীন হওয়া বাংলাদেশ। এইগুলো আমার কবিতায় প্রথম এসে যায়।"[৬]

অন্যদিকে কবি আকৈশোরিক কাল অতিবাহিত করেছেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও চট্টগ্রামের নদী ও নিসর্গের বিস্তীর্ণ এলাকায়। এই স্থান-কালের অভিজ্ঞতা তাকে প্রকৃতিপ্রেমিক ও নির্মাতা করে তোলে। অবশ্য কবি নিজেই তাঁর কবিতার বিষয়রূপে নারীর সঙ্গে প্রকৃতিকে উল্লেখ করেছেন -

> "আমার বিষয় তাই, যা গরিব চাষীর বিষয়
> চাষীর বিষয় বৃষ্টি, ফলবান মাটি আর

কালচে সবুজে ভরা খানা খন্দহীন
সীমাহীন মাঠ।"
['কবির বিষয়', অদৃষ্টবাদীদের রান্নাবান্না]

কবি নিজেকে একজন চাষীর সমগোত্রীয় মনে করেন; যার অন্যতম প্রধান বিবেচ্য হল প্রকৃতি : বৃষ্টি, বৃষ্টিসিক্ত প্রাণময় ফলবান মাটি; যে মাটি সবুজ সীমাহীন ফসলের মাঠ ও জীবন-জীবিকার ভিত্তি গড়েছে। সেজন্যে কবি 'একটি চাষীর মত' 'সমস্ত প্রাকৃতিক আয়াত' শিখেছেন। এখানেই প্রকৃতিকেন্দ্রিক কবির স্বতন্ত্র মনোভাব প্রকাশিত। সমকালীন একজন কবির মতে, -

> "আল মাহমুদ-এর কবিতার ধর্ম নিসর্গ প্রেম। তাঁর প্রায় সব কবিতাই এই ধারাবাহিক অনুভূতি থেকে জায়মান। কোন কবিতাই এই বোধ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়।"[৭]

আল মাহমুদের কবিতার কেন্দ্রীয় বিষয় ও প্রকরণে প্রকৃতির নান্দনিক ও বাস্তব, উভয় দিকই প্রতিফলিত।

বাংলার প্রকৃতি রূপায়ণে আল মাহমুদের কবিতা : বাংলা কবিতায় বহুদিন থেকে মুগ্ধ ও আবিষ্ট চোখে প্রকৃতি বর্ণনার যে ধারা চলে আসছিল, তার সঙ্গে আল মাহমুদ প্রকৃতির বাস্তব ও স্বাধীন রূপের চিত্র আঁকেন।

প্রথমত, নান্দনিক-দার্শনিক ও সামাজিক-রাজনৈতিক স্বরূপকে কবি প্রকৃতির সামগ্রিক রূপকল্পে;
দ্বিতীয়ত, প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান- নদী, বৃষ্টি ও মৃত্তিকার চিত্রকল্পে প্রকাশ করেন।

১

আল মাহমুদ সামগ্রিক দৃষ্টিতে প্রকৃতিকে দেখেছেন। প্রথমত প্রকৃতির নান্দনিক ও দার্শনিক দিকটির প্রতি মনোযোগী হয়েছেন। প্রকৃতি সৌন্দর্য, মুগ্ধতা, অবসর, সূক্ষ্ম অনুভূতি, বোধ ইত্যাদির আধার; রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দ দাশের কাব্যসৃষ্টি ও ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্রথম পর্যায়[৮] কবির মাঝে এ-ধরনের মনোভাবের সৃষ্টি হয়। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'লোক লোকান্তরে' মূলত এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে। প্রকৃতির মাঝে প্রকাশিত ও উৎসারিত সৌন্দর্য ও ধ্বনির প্রতি কবি মুগ্ধ হয়ে নিজেকে 'ধ্বনির যাদুকর' ও 'জলপানশব্দের শিকারি' রূপে চিহ্নিত করেন।

"নিসর্গের ফাঁকে ফাঁকে যখন বিষণ্ন হাওয়ার রোদন
দুঃখের নিশ্বাস ফেলে, আমি সেই
ধ্বনির যাদুকর।
চিতল হরিণী তার দ্রুতগামী ক্লান্তির শেষ যামে
যখন প্রস্রবণে পিপাসায় মুখ নামায়,
আমি সেই জলপানশব্দের শিকারি।"
['পিপাসার মুখ', লোক লোকান্তর]

প্রকৃতির মাঝে বিরাজমান সৌন্দর্য, ধ্বনি ও শব্দ কবির কাব্যপ্রকৃতির প্রধান অবলম্বন। এক অর্থে কবি নিজেকে প্রকৃতির কবি হিসেবে উপস্থাপন করেন। নাগরিক ক্লান্তি-অবসাদ-ব্যস্ততা থেকে মুক্তির জন্যে নিসর্গে আশ্রয় ও অবসর কবির কাম্য।

কবি মনে করেন নিসর্গ নগর যন্ত্রণা থেকে মুক্তির জায়গা, বসবাসের নয়। ফলে কবি অরণ্যের জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হতে এবং অরণ্যের জীবন, প্রকৃতি ও জীবজন্তুর সঙ্গে সহজ আত্মীয়তা গড়ে তুলতে পারেননি। অরণ্যে প্রাকৃতিক নিয়ম-শৃঙ্খলার স্বাভাবিক পবিবেশে কবি বিস্ময় ও ক্লান্তি অনুভব করেন। তাঁর চিন্তায় দার্শনিক ভাবনা ও জীবনযাপনে নান্দনিক বোধের প্রকাশ ঘটেছে। 'অরণ্যে ক্লান্তির দিন' কবিতায় কবি তাই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও স্বাভাবিকতা অবলোকন করে নিজেকে বেমানান ও অসুখী ভেবেছেন।

"কিন্তু তবু ঘটে না কিছুই, আকাশ তেমনি থাকে,
কী করে যে ভোর হয়, আসে যায় ঋতুর পাখিরা

বসন্তের কত ফুল অলক্ষেই ফল হয়, পাকে;
গভীর অরণ্য ছেড়ে উড়ে আসে বুনো মুরগিরা,
বানরের চেঁচানিতে ভরে যায় শেগুনের শাখা।"
['অরণ্যে ক্লান্তির দিন', লোক লোকান্তর]

বনের পরিবেশের সঙ্গে কবি একাত্ম হতে পারেননি। প্রকৃতি যে একটা বিশেষ প্রাণব্যবস্থায় (Eco-system) পরিচালিত হয়, তার শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্যে নাগরিক মনের কবি নির্বিকার। হঠাৎ কিছু না ঘটার বৈচিত্র্যহীন ও উত্তেজনাহীন দিনযাপনে কবি অবসাদে ভোগেন। কেননা 'লোক লোকান্তর' কাব্য সৃষ্টিকালে অর্থাৎ ষাটের দশকে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন কাব্যান্দোলনে অনুরক্ত কবি নাগরিক ও বোদলেয়ারীয় মনোভাবের অধিকারী ছিলেন। অন্যদিকে 'অরণ্যে অসুখী' কবিতায় কবি বনের জীব-জন্তু-বন্যবৃক্ষ-উদ্ভিদ, ফুল-পাহাড় অর্থাৎ সবকিছুরই স্বাধীন, সহজ ও স্বতন্ত্র সত্তার অনভবে আনন্দিত; নিজেকে শুধু অলস ও অসুখী ভেবেছেন, কিন্তু দূরের পাহাড় ও কবি 'পরস্পর বৃদ্ধ দুটি' সত্তা বেঁচে থাকতে চেয়েছেন চিরকাল। অবশ্য তখনই কবির মনে হয়েছে - 'অরণ্যে সবই সদ্য ফোটা প্রথম মাতাল'। কবি প্রথম পর্যায়ে এক ধরনের রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন।

কবির দার্শনিক চিন্তা ও বাঙালির কৃষিজীবনের ঐতিহ্যিক ভাবনার কেন্দ্র 'সোনালি কাবিনে'র 'প্রকৃতি' কবিতাটি। এখানে কবি প্রকৃতি ও নারীকে অভিন্ন কল্পনা করেন। তাই বর্ষণে ভেজা মৃত্তিকাকে কবির মনে হয় 'প্রিয়তমা কিষাণী'। প্রকৃতির সৃজনক্ষমতা ও নারীর সৃষ্টিশীলতাকে অভিন্নরূপে দেখেছেন।

"ক্ষীরের মতন গাঢ় মাটির নরমে
কোমল ধানের চারা রুয়ে দিতে গিয়ে
ভাবলাম, এ-মৃত্তিকা প্রিয়তমা কিষাণী আমার।
বিলের জমির মতো জলসিক্ত সুখদ লজ্জায়
যে নারী উদাম করে তার সর্ব উর্বর আধার।"
['প্রকৃতি', সোনালি কাবিন]

প্রকৃতিকে নারীর প্রতিরূপ হিসেবে দেখার মধ্যেই কবি সীমিত থাকেননি। এই প্রকৃতি প্রাণ, প্রাণবৈচিত্র্য, বাস্তুসংস্থান, খাদ্য-শৃঙ্খলা, প্রাণের সৃষ্টি-বিকাশ-বিনাশ, দ্বন্দ্ব-সংঘাত ধারণ করে আছে। প্রকৃতি তাই কবির কাছে 'মৃন্ময়ী' পৃথিবী- যেখানে মাছ, পাখি, পশু ও মানুষের জন্ম বা জীবের উৎসস্থল। যেখানে প্রাণী ঘাস বা তৃণ খেয়ে বাঁচে; আবার সেই প্রাণীকে ভক্ষণ করে বাঁচে অন্য প্রাণী, সেই প্রাণীকে আরো শক্তিশালী প্রাণী গ্রাস করে জীবন ধারণ করে এবং অবশেষে মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে মাটিতে মিশে যায় তার দেহাবশেষ। প্রাণী ও জীবজগৎ উভয়ে মিলে এক প্রাকৃতিক পরিবেশ গড়ে ওঠে। এভাবে একটা বাস্তুসংস্থান (Ecology) গড়ে ওঠে প্রকৃতিতে। জগতে প্রাণের বিবর্তনধারার কেন্দ্রে কবি নারী ও প্রকৃতিকে স্থাপন করেন নিজস্ব ভাষা, প্রতীক ও চিত্রকল্পে।

"বুঝিবা স্বপ্নের ঘোরে আইল বাঁধা জমিনের ছক
বৃষ্টির কুয়াশা লেগে অবিশ্বাস্য জাদুমন্ত্রবলে
অকস্মাৎ পাল্টে গেলো। ত্রিকোণ আকারে যেন
ফাঁক হয়ে রয়েছে মৃন্ময়ী।
আর সে জ্যামিতি থেকে
ক্রমাগত উঠে এসে মাছ পাখি পশু আর মানুষের ঝাঁক
আমার চেতনা জুড়ে খুঁটে খায় পরস্পর বিরোধী আহার।"
['প্রকৃতি', সোনালি কাবিন]

প্রকৃতির মধ্যে জীবজগতে পরস্পর যে বিরোধ তা অবলোকন করে কবি আত্মচেতনার মাঝেও দ্বন্দ্ব অনুভব করেন। জগতে প্রাণের সৃষ্টি, বিকাশ ও বিনাশের কার্যকারণ শৃঙ্খলা বা দার্শনিক সূত্র কবি প্রকৃতি ও নারীর অভিন্নতায় প্রকাশ করেন।

তবে কবি প্রকৃতি ও নারীর মাঝে যে সম্বন্ধসূত্র আছে তাকে উপলব্ধি করতে চান। প্রকৃতির ভেতরদেশে পাস্পরিক সম্পর্ক, নিয়ম-শৃঙ্খলা এবং সৃষ্টিতত্ত্বের প্রমাণ কবি চোখের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে পেতে চান। এ জন্য কবি প্রকৃতি ও নারীর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখেন।

"চোখ বড় সাংঘাতিক রক্তের প্রান্তর ছুঁয়ে থাকে-
নিসর্গ নিবদ্ধ করে দেখে নেয় নারী আর নদীর নিতল।
ধরে রাখে মাছ পাখি পশু আর পতঙ্গের প্রসঙ্গ সকল
সমস্ত সম্বন্ধসূত্র ভেদ করে চায় তীব্র চাক্ষুস প্রমাণ।"
['আভূমি আনত হয়ে', সোনালি কাবিন]

অনুসন্ধিৎসু মন থেকে কবি এ-ধরনের দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক সত্যে পৌঁছাতে চান। মানব-মানবী এবং বৃহৎ প্রকৃতিতে প্রাণীকুলের মধ্যে পরস্পর যে সম্পর্ক তার মাঝে একটা গূঢ় ঐক্যসূত্র কবি আবিষ্কার করতে চেয়েছেন।

প্রকৃতি বিষয়ে 'কালের কলস' থেকে আল মাহমুদের নান্দনিক দৃষ্টির অবসান ঘটতে থাকে এবং বাস্তবতার দিকে আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। ষাটের দশকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের সময়কালে স্বদেশের উপর দিয়ে দুঃশাসনের যে দুর্যোগ বয়ে যায়, তাকেই কবি প্রকীকায়িত করেছেন প্রকৃতির বিবর্ণ ও ধূসর দৃশ্যের বর্ণনায়। 'রবীন্দ্রনাথ' কবিতায় কবি অন্ধকার 'উত্থান রহিত' 'বঙ্গদেশে'র 'নিষ্ফলা' চিত্র আঁকেন। এলিয়টের Wast Land-এর পোড়ো-পরিত্যক্ত নিষ্ফলা ভূমির ছবি এ কবিতায় প্রতিফলিত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ইউরোপের জীবনধারার ধূসরতা-অবক্ষয়-অফলার ভিত্তিতে এলিয়ট এ কাব্য রচনা করেন; অন্যদিকে আল মাহমুদ ষাটের দশকের আইয়ুব খানের সামরিক শাসনে (১৯৫৮-৬৮) সামাজিক-সাংস্কৃতিকভাবে নিষ্পেষিত দেশকে সেই দৃষ্টিতে বিচারে আনেন। এ-কবিতায় বর্ণিত চিত্রে ডালে আর পাখি বসে না, নদীগুলো দুঃখময়, পতঙ্গহীন মাটিতে কোন সবুজ জন্মায় না, শ্যামলতাহীন মাটিতে কেবল ব্যাঙের ছাতা গজায়; কবির প্রশ্ন এই বাংলায় কীভাবে রবীন্দ্রনাথ পুনর্জন্মের আকাঙক্ষা পোষণ করতেন। এখন সবাই পুনর্জন্মের বিরোধী। তাই কবি বলেন -

"শুনুন, রবীন্দ্রনাথ আপনার সমস্ত কবিতা
আমি যদি পুঁতে রেখে দিনরাত পানি ঢালতে থাকি
নিশ্চিত বিশ্বাস এই, একটিও উদ্ভিদ হবে না
আপনার বাংলাদেশ এ রকম নিষ্ফলা, ঠাকুর।"
['রবীন্দ্রনাথ', কালের কলস]

এমন এক প্রাকৃতিক পরিবেশ ঘেরা দেশে কেবল অবিশ্বস্ত হাওয়া আছে, তবে কোনো শব্দের দ্যোতনা নেই; শুধু দু'একটি পাখি ভয়ে ভয়ে সঙ্গীতের ধ্বনি নিয়ে বৃষ্টিহীন বৈশাখ মাসের পঁচিশ তারিখে বাক্যালাপ করে। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনেও এ-দেশ রাবীন্দ্রিক স্নিগ্ধ প্রকৃতি বিরোধী। গ্রামীণ বাংলায় বৈশাখ মাসে প্রকৃতির যে চেহারা ফুটে ওঠে তারই নিখুঁত দৃশ্য এঁকেছেন দেশের বিশেষ অবস্থা বোঝাতে। প্রকৃতির সামাজিক ও রাজনৈতিক দিকটির প্রতি কবি দৃষ্টিপাত করেন।

বাঙালির জীবন ও জগৎ ভাবনার কেন্দ্রে প্রকৃতি কার্যকর। তাই বাঙালির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মূলে কৃষিভিত্তিক উৎপাদন-ব্যবস্থা বর্তমান। এদেশের কৃষক প্রকৃতি বলতে কৃষিক্ষেত্রকেই বোঝে। জীবন-জীবিকার ক্ষেত্র হিসেবে প্রকৃতির ভূমিকার সঙ্গে খনাকে কবি উপস্থাপন করেন। কৃষিভিত্তিক প্রকৃতির রহস্য ও শৃঙ্খলা জ্যোতিষী খনা নিখুঁতভাবে গণনা করতে পারতেন। বিশেষভাবে ঋতু ও আবহাওয়ার সঙ্গে ফসল উৎপাদনের নির্ভুল সূত্র তাঁর বচনে পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে কবি প্রকৃতি-অভিজ্ঞ খনাকে সামনে আনেন। কবির মতে, প্রকৃতির ছদ্মবেশ বা রহস্য ব্যাখ্যা করেন বিদূষী নারী খনা। প্রথম পর্বে 'সোনালি কাবিন' কাব্যের 'প্রকৃতি', দ্বিতীয় পর্বে 'অদৃষ্টবাদীদের রান্নাবান্না'র 'কবির বিষয়' এবং তৃতীয় পর্বে 'দ্বিতীয় ভাঙনে' 'খনার বর্ণনা'য় কবি খনাকে প্রকৃতি ভাবনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিরূপে উপস্থাপন করেন। কবি খনাকে 'প্রকৃতির ছায়া' রূপে অভিহিত করে তাঁর গুরুত্ব তুলে ধরেন।

"খনা তো অনার্য কন্যা প্রকৃতির ঠোঁট কাটা কবি
জমিনের গন্ধ শুঁকে ফসলের ভবিষ্য বাখানে;"

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 45
Website: https://tirj.org.in, Page No. 395 - 409
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

['খনার বর্ণনা-৪', দ্বিতীয় ভাঙন]

অথবা -

"নিসর্গের নীতি মেনে এসো পতি, মেঘবৃষ্টি গণি
জগতের উপকার জ্যোতিষের শাস্ত্রে লেখা নাই;
ঋতুর বৈচিত্র্যে কাঁপে লীলাবতী খনার ধমনী
মাটির মাহাত্ম্য গেয়ে এসো দোঁহে লাঙলে দাঁড়াই।"

['খনার বর্ণা-৫', দ্বিতীয় ভাঙন]

প্রকৃতির অসংবাদিত লোকবিজ্ঞানী, কবি ও ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা হল খনা। প্রকৃতির রহস্য ব্যাখ্যার জন্যে মানুষ খনার বচন স্মরণ করে। সেজন্যে কবি প্রকৃতির অন্তরালে ও রহস্যে প্রবেশের জন্যে খনার আশ্রয় নেন। জমিনে ফসল উৎপাদনকারী বৃষ্টির উপমা দিতে কবি খনার বচনের সঙ্গে তুলনা দেন। এ-ক্ষেত্রে কবির লোক ঐতিহ্যমুখিতার পরিচয় মেলে।

আল মাহমুদের কবিতায় বারবার একই সঙ্গে প্রকৃতি ও নারীর প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। প্রকৃতির নান্দনিক-দার্শনিক রূপের অপর পিঠে আছে প্রকৃতির বাস্তব চিত্র। কৃষকদের চাষাবাস করার এবং চাষবাসের মধ্যে জীবনযাপনের করার অধিকার আছে। সেজন্য প্রতিটি কৃষকের সঙ্গে প্রতিটি কৃষক, প্রতিটি কৃষকের ঘরনীর সঙ্গে প্রতিটি কৃষক পুরুষ, তার হালবলদের সঙ্গে তার জমিজমা যুক্ত। এই যুক্ততা একই সঙ্গে ব্যক্তিক ও সামষ্টিক। বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস পরিপূর্ণ হয়ে আছে কৃষকের জমি ও জমির ফসল দখলের কাহিনীতে। বৌদ্ধযুগের অবসানে বাংলায় ব্রাহ্মণ্য শাসন, শোষণ, বর্ণপ্রথা, বিভেদ ইত্যাদি মানবতাবিরোধী কার্যক্রমের কারণে সমাজজীবনে শান্তি, সাম্য ও নিরাপত্তা ছিল না।[৯] কৃষকের উৎপাদিত শস্য লুণ্ঠিত হয়ে যেতো। নারীর চেয়ে শস্যের নিরাপত্তা নিয়ে বেশি উদ্বিগ্ন সেই সময়ের বাঙালি কৃষকের আর্তি শোনা যায় 'সোনালি কাবিনে'র ৯ নম্বর কবিতায়-

"ললিত সাম্যের ধ্বনি ব্যর্থ হয়ে যায় বারবার:
বর্গীরা লুটেছে ধান, নিম খুনে ভরে গেছে জনপদ
তোমার চেয়েও বড়ো হে শ্যামাঙ্গী, শস্যের বিপদ।"

['সোনালি কাবিন: ৯', সোনালি কাবিন]

প্রকৃতি ও নারীর ভাবনা ইতিহাসের সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে একাকার হয়ে আছে। উপনিবেশে, ব্রিটিশ বাংলায় এবং পাকিস্তানী বাংলায় নিসর্গ, যেখানে জমি অবস্থিত, জমির অভিধা সেখানে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক, জমি চূড়ান্ত পর্যায়ে মালিকানা, খাজনা, স্বত্ব, রায়তী সম্পর্ক, বীজ, পানি, শ্রমের আধার। জমির পক্ষে তাই নিসর্গ হওয়া সম্ভব নয়। নিসর্গ অর্থাৎ ভাবনা, দর্শন, সুন্দর, দিগন্ত কিংবা বিস্তৃতি, যেখানে নদীর বাঁক, বনের শ্যামল, ধানের হলুদ-সোনালী রঙ, নারীর অবাক নয়ন কিংবা পশুর বিচরণ অবস্থিত। যেক্ষেত্রে নিসর্গ জমি সেক্ষেত্রে নান্দনিকতা বিরল কিংবা ন্যূনতম; নিসর্গ যেক্ষেত্রে উধাও, দিগন্ত সেক্ষেত্রে নান্দনিক। সেজন্য ঔপনিবেশিক প্রভু, জমিদার, শিল্পপতি, বুর্জোয়ারা শিল্পের কথা প্রথম ভেবেছে, জমির কথা পরে।[১০] বঙ্গীয় ও ঔপনিবেশিক সংস্কৃতিতে নিসর্গের নান্দনিক সমঝদারি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে। এই সমঝদারি ও উন্নয়নের ভিত্তি থেকে তৈরি হয়েছে গ্রামীণ নান্দনিকতা - প্রশস্ত জীবন, অবসর, আরাম আয়েশ। অথচ এই জীবনের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে জমিনকেন্দ্রিক দ্বান্দ্বিক বাস্তবতা ও নারীর ভূমিকা। আল মাহমুদ ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে স্বতন্ত্র ও স্বকীয়। কবি রাম বসুর (জ. ১৯২৫) মতে -

> "নিজের জীবনের অনুষঙ্গ থেকে দেশের সামগ্রিক সংবাদকে তিনি অনায়াসে স্বচ্ছন্দে কবিতায় বিধৃত করতে পারেন। অনাবিল নির্মলতায় নিয়ে আসেন নিসর্গ। তখন মানুষ ও প্রকৃতির কৃত্রিম কলহ আর থাকে না। এক আনন্দময় স্তব্ধতা আমাদের আপ্লুত করে। এ-কথা এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে, নিসর্গ সম্বন্ধে ইয়োরোপের দৃষ্টিভঙ্গি এবং বাংলার দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য অসাধারণ। ধর্মীয় ঐতিহ্যের কথা বিবেচনা করলে হিন্দু ও মুসলিম মানসিকতায় এই নিসর্গ বাইরের কোনো আরোপিত জিনিস নয়, বিশ্বচেতনার সঙ্গে তা অঙ্গীভূত।"[১১]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 45
Website: https://tirj.org.in, Page No. 395 - 409
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আল মাহমুদ শেষপর্যন্ত প্রকৃতি বলতে দেশজননী বুঝেছেন। প্রথম পর্বে প্রকৃতি কবির কিষাণী নারী আর তৃতীয় পর্বে দেশ হল কবির মা; মায়ের অঙ্গ-প্রতঙ্গ হল প্রকৃতি। তাই তাঁর দেশ আর দেশের প্রকৃতি অভিন্ন। বঙ্গজননী আর প্রকৃতি অঙ্গাঙ্গিরূপে বিরাজমান -

"তোমার নদীগুলো আবার সমুদ্রের দিকে ধাবমান হবে। চিম্বুক পাহাড়
হবে তোমার স্তনাগ্রচূড়ার মত মাতৃত্বের গৌরব।"
['দেশ মাতৃকার জন্য', দ্বিতীয় ভাঙন]

কবি প্রকৃতি ও মায়ের শরীরী অভিন্নতায় দেশ প্রেমকে জাগ্রত করেন। স্বদেশের স্বার্থে কবি যেহেতু উচ্চকিত, সেহেতু প্রকৃতি মায়ের অস্তিত্ব রক্ষায়, প্রাণের স্বাভাবিক গতি ও বিকাশে এবং বিনাশ প্রতিরোধে কবি প্রত্যয়দীপ্ত।

আল মাহমুদের নারী ভাবনা, স্বদেশচেতনা ও প্রত্যাবর্তন, সমাজচেতনা ও ঐতিহ্যমুখিতা অর্থাৎ মৌলিক বিষয়াবলির পটভূমি হল প্রকৃতি। আবার প্রকৃতি তাঁর কবিতার অন্যতম প্রধান বিষয় হবার কারণে তিরিশের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত নাগরিক অনুভব এবং তৎসংশ্লিষ্ট হতাশা-নির্বেদকে পাশ কাটিয়ে আল মাহমুদ ফিরে যেতে চেয়েছেন আবহমানকালের গ্রাম নিসর্গের ভেতর[১২] গ্রামের চাষা-হালবলদ, লাউয়ের মাচায় সিক্ত নীল শাড়ির নিশান, দূরের নদী-হাটের নাও-মাঠ, জোনাক পোকা, ধান ক্ষেত, ফুল-বসন্তের পাখি, নারীর ধান ঝাড়া, ধানের ধুলোয় ম্লান শাড়ি, গায়ে ও শাড়িতে শস্য মাড়ায়ের গন্ধ ইত্যাদির মাঝে কবির বসবাস। তাই কবি বলেন: 'মানুষের বাসস্থান, লাউমাচা, নীলাম্বরী নিয়ে আমরা থাকতে চাই'। নদীর নাচের ভঙ্গি, পিতলের ঘড়া, হুঁকোর আগুন, চুড়ুইয়ের বাসা, নিমডালে বসে থাকা হলুদ পাখি, পিঠার পেটের ভাগে ফুলে ওঠা তিলের সৌরভ, মাছের আঁশটে গন্ধ, কুরুলিয়ার পুরনো কই ভাজা, সোনালি খড়ের স্তূপ, কলাপাতায় মোড়া পিঠার মতো হলুদমাখা চাঁদের জোছনাময় প্রকৃতির মাঝে কবি বসতি গড়ে তোলেন। এক কথায়, কবির স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মূল প্রেরণা স্বদেশের আজন্ম লালিত প্রকৃতি।

আল মাহমুদ কবিতায় প্রকৃতি সম্বন্ধে রোমান্টিক ও দার্শনিক সত্য থেকে ক্রমান্বয়ে সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির স্বাক্ষর রাখেন। প্রকৃতিকেন্দ্রিক জীবনের স্বতঃস্ফূর্ততা, জনজীবনের বাঁচা-মরার লড়াই এবং জীবনের বিকাশ ও প্রকাশের প্রেরণা তাঁর কবিতায় প্রাণবন্ত। জসীমউদ্দীনের কবিতায়, আব্বাসউদ্‌দীনের লোকজ সঙ্গীতে, রমেশ শীলের গীত, কবির লড়াইয়ে এই দিকটি প্রবলভাবে উৎসারিত হয়েছে। আল মাহমুদ এই ধারাকে কবিতায় ধারণের মাধ্যমে নিজস্ব শিল্পভুবন সৃষ্টি করেন।

২

আল মাহমুদ প্রকৃতি বলতে জমিনকে ভেবেছেন। তাঁর কবিতায় একটা বড় জায়গা জুড়ে আছে এই জমিন। জমিন বা মাটিই পৃথিবীর প্রধান উপাদান। জীবন-জীবিকার প্রধান অবলম্বন এই মাটি। নিসর্গ, ফসল, প্রাণবৈচিত্র্য, খনিজ সম্পদ সব কিছুই মাটিকেন্দ্রিক। তাঁর কবিস্বভাবের সঙ্গে মাটির সম্পর্ক বিবেচনা করে অগ্রজ কবি সৈয়দ আলী আহসান বলেন -

"মাটির প্রশ্রয়ে থেকে মাটিকে ছুঁয়েছ অবিরাম
শীতল সকাল বেলা অথবা দুপুর যদি হয়
অথবা সন্ধ্যার ছায়া স্নিগ্ধতায় নয়নাভিরাম-
সকল সময়ে তুমি মাটিতেই চেয়েছ আশ্রয়।"[১৩]

সে কারণে এই কবি মৃত্তিকাকে বিশেষ গুরুত্ব দেন। মাটির আশ্রয়ের জন্যে ভাটি বাংলায় কবি হাহাকার করেন। 'কালের কলসে' 'ফেরার পিপাসা'য় মায়ের স্মৃতিতে নদী ভাঙনে ছিন্নমূল কবি-পরিবার একটু মাটির আশ্রয়ের জন্যে ঘুরে বেড়িয়েছে।

"প্রবল হাওয়ার মধ্যে আদিগন্ত শোকের কিনারে
নিঃশব্দে উড়তে থাকি ঢেউয়ে ঢেউয়ে, যদি কোনদিন,
আদিম উদ্ভিদ রেখা দেখা দেয়- কোমল কৌশিক
দারুণ বালুর বেগ, দিগি¦জয়ী মাটির মহিমা।"

['ফেরার পিপাসা', কালের কলস]

কবি মাটি বা আশ্রয়হীন হয়ে 'শোকের কিনারে' ঢেউয়ের উপর ভেসে যেতে থাকে সহায়-সম্বলহীন অবস্থায়। তবু অস্তিত্বের আশায় অপেক্ষার প্রহর গুনেগুনে কবি দিন অতিবাহিত করেন - 'মাটির মহিমা' কবে তাদের ঢেউয়ের গ্রাস থেকে রক্ষা করবে। এই কবিতায় মৃত্তিকাকে ঘিরে কবি মাটিকেন্দ্রিক চেতনাকে স্বচ্ছভাবে উপস্থাপন করেছেন।

কবি মৃত্তিকা বলতে ফসলের মাঠ বোঝেন। মৃত্তিকার ছবি আঁকতে তাই দৃষ্টিনন্দন কোনো দৃশ্যের কথা তাঁর মনে আসে না। কর্ষণের জায়গা, ফসল উৎপাদন ও ফসলভরা জমিনকে কবির মনে আসে। 'নগরীর কথা নয় চাষবাসের গল্প' (২০০৭) কাব্যের নাম কবিতায় প্রকৃতি বলতে কবি সমগ্র পৃথিবীর জমিনকেই ভেবেছেন এবং তা কর্ষণের ক্ষেত্র হিসেবেও দেখেছেন।

"তাহলে বলো আমি চরণ বাড়ালেই কেন মায়াজালের মতো
সারা পৃথিবীটাকে মনে হবে আমার লাঙ্গলের অপেক্ষায়।
আমি আমার কৃষি ক্ষেত্রে একদিন খুব ভোরবেলায়
কুয়াশায় ভিজতে ভিজতে হাজির হবো নাকি?"
[নগরীর কথা নয় চাষবাসের গল্প]

এই কারণেই কবি ফলবতী নারীর সঙ্গে কর্ষিত ও শস্যভরা মাটির তুলনা করেছেন বারবার। 'প্রকৃতি' কবিতায় কৃষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে কবি মৃত্তিকাকে ভেবেছেন প্রিয়তমা নারী - 'কোমল ধানের চারা রুয়ে দিতে গিয়ে ভাবলাম/ এ-মৃত্তিকা প্রিয়তমা কিষাণী আমার।' আসলে কবি নিজেকে ভাবেন একজন বাঙালি কিষাণ, যে কিষাণ জমিন কর্ষণ করে নারী ও সন্তানের জন্যে ফসল ফলায়; যেমন নারীদেহের জমিনে আবাদ করে সন্তান উৎপাদন করেন। শস্য ও সন্তান উৎপাদনের ক্ষেত্র যথাক্রমে জমিন ও নারী। প্রাচীন কৃষিব্যবস্থা ও বিশ্বাসে নারী ও জমিনের উর্বরতাকে সমান্তরাল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাই নারীর দেহজমিনে কবি রহস্যের বীজ বা জন্মকণা বুনতে চান, চাষাবাদ করে ফসল ফলাতে ইচ্ছুক।

ক "পুরুষ চালায় হাল, আল ভেঙে ঠেলে যায় ফাল
মাটিকে মাখন করে গোঁজে বীজ, গোঁজে জন্মকণা
নারীর কোষের মাঝে রাখে কীট
কালোত্তীর্ণ প্রাণের কীটাণু।"
['কবির বিষয়', অদৃষ্টবাদীদের রান্নাবান্না]

খ "মাঝে মাঝে মনে হত মাটি চাই।
অন্তহীন দিগন্ত বিস্তৃত কোনো শূন্য মাঠ।
যেখানে ফলবে ধান, কাউনের সোনা আর
ছোট কলসির মতো টই টই তরমুজের রক্তভরা রস।
একটি কিষাণী চাই। সেও হবে অস্পৃষ্ট মাটির মতো
অন্যসব কৃষকের স্পর্শের অচেনা
দু'টি শূন্য মাঠে আমি বুনবো বীজ
ভরাবো ফসলে।"
['ছিন্নভিন্ন স্মৃতিসূত্র: ৬', প্রহরান্তের পাশফেরা]

কবির এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি তৃতীয় পর্বের কবিতায়ও দৃষ্ট হয়। নিজেকে প্রকৃত ও বিশ্বস্ত কৃষক হিসেবে উপস্থাপন করে কবি বলেন -

"অবিশ্বস্ত চাষা যদি বীজ বুনে তোমার আবাদে
বিস্বাদ শস্যের আঁটি নিতে হবে ফ্যাসাদে, বিবাদে।"

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 45
Website: https://tirj.org.in, Page No. 395 - 409
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

[‘স্তব্ধতার চাষী’, নদীর ভিতরে নদী]

কবি তাই প্রিয় নারীকে শুধুমাত্র তার জন্যে প্রস্তুত হতে অনুরোধ করেন। এর ব্যতিক্রমে জন্ম নেবে আগাছা এবং ঘটে যেতে পারে সংঘাত, সে-কারণেই কবির আকুতি: নারী যেন দেহ জমিনে শুধু তাকে আবাদ করতে দেয়।

আল মাহমুদ গর্ভধারিণী হিসেবেও মাটিকে চিহ্নিত করেন। ‘এক চক্ষু হরিণ’ কাব্যে ‘জন্মদিন’ কবিতায় মৃত্তিকাকে কবি ‘ফেটে যাওয়া মায়ের উদর’রূপে অভিহিত করে আষাঢ়ের বর্ষণে ‘প্রথম পুত্রকে’ মনে পড়ে কি না, সেই প্রশ্ন তোলেন। আর প্রসবের কাঁপা কান্নাকে কবির মনে হয়েছে ‘বাংলার ঝিঁঝির ঝংকার’। যে-মাটির উদর থেকে কবির জন্ম সেই জমিনের স্তনের লবণ, আঠাদুগ্ধ আর ক্লান্তি শুষে নিয়ে কবি গাছের মতো বেড়ে ওঠেন। অতঃপর নদীর কিনারে কবি যেন কদম্বের ডাল হয়ে যান। প্রকৃতপক্ষে, কবি জন্মদিনে নিজের উৎসের সন্ধান মাটিতেই খুঁজে পেয়েছেন। সেজন্যে কবির জিজ্ঞাসা -

“হে গর্ভিণী মাটি, ফেটে যাওয়া মাংসের উদর
হঠাৎ কি মনে পড়ে ভেলায় ভাসিয়ে দেয়া অসহায় শিশুর রোদন?”

[‘জন্মদিনে’, একচক্ষু হরিণ]

কবি জন্মমুহূর্তের ঘটনা স্মরণ করে নিজের অর্থাৎ ‘অসহায় শিশুর রোদন’ মনে আছে কিনা সেই প্রশ্ন উত্থাপন করেন। অর্থাৎ কবি অস্তিত্বের উৎসানুসন্ধানে কৌতূহলী। আত্মআবিস্কার ও আত্মপরিচয় জানার ব্যাপারে আগ্রহী। মাটির দ্বারা সৃজিত মানুষের আদি পিতা আদমের প্রথম পুত্রের সাথে কবি নিজেকে একই সূত্রে উপস্থাপন করেন। কেননা একই পিতা ও মাতার গর্ভ থেকে সকল মানুষের সৃষ্টি।

৩

নদী আল মাহমুদের আশৈশব অন্তরঙ্গ সঙ্গী। নদীর সৌন্দর্য-ভাঙন-আগ্রাসন-মৃত্যু-নারীর সাথে প্রতিতুলনা ইত্যাদি তাঁর কবিতায় স্বকীয় শিল্পদৃষ্টিতে দৃশ্যমান। ‘তিতাস’ তাঁর শৈশবের নদী। তাঁর অঙ্কিত নদীগুলো তিতাস নামে একটি নদীরই অভিসারী ও প্রতিচ্ছায়া। তাঁর যে কোন নদী তিতাস। মায়াবী এ নদী তীর ভাঙে, ঘোলাস্রোত পাক খায়, নৌকার পালে বাতাসে গতিশীল হয় যৌবনের প্রতীকের মতো, সলিমের বউ মাটির কলসে করে ভিজে পায়ে পানি নিয়ে যায়; পানকৌড়ি-মাছরাঙা-বক পাখায় জলের ফোঁটা ফেলে দিয়ে উড়ে যায়; এবং জনপদে ‘অধীর কোলাহল’ নিয়ে আসে। কিন্তু কবি সে সবের কিছুই এখানে খোঁজেনি। যতবার নদীর কাছে এসেছেন, ততবারই নীরব তৃপ্তির জন্যে আনমনে ঘাসে বসে নির্মল বাতাসে বুক ভরেছেন; অতঃপর একটি কাশের ফুল আঙুলে ছিঁড়ে নদীর পথ ধরে হেঁটে চলে গেছেন আপন ঠিকানায়। আসলে এ নদীর সবকিছুই কবির চেনা-জানা, এর সাথে সম্পর্ক অন্তরঙ্গ। সেজন্যেই ‘তিতাসে’র সান্নিধ্যই তার তৃপ্তির জন্যে যথেষ্ট। আবার কবি জীবিকার প্রয়োজনে যখন শহরে বসবাস শুরু করেন, তখনও ঘুমের অবসাদে স্বপ্নের মধ্যে ‘তিতাস’ তাঁর হৃদয়ে গভীর জলধারা ছড়িয়ে যায়। নিজেকে মনে হয় সোনার বৈঠার আঘাতে ‘পবনের নাও’, যে নাও তিনি একা বয়ে নিয়ে যান ‘অলৌকিক যৌবনের দেশে’[১৪]। অর্থাৎ চেতনে এবং অবচেতনে এ নদী কবির কাছে নিত্যসঙ্গী- জীবনানুভব, তৃপ্তি, আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নের অবলম্বন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত যেমন প্রবাসজীবনে গিয়ে ‘কপোতাক্ষে’র প্রতি তীব্র প্রেমভাব ও আত্মীয়তা অনুভব করেন, আল মাহমুদও নদী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নগরবাসী সেই রকম উপলব্ধি করেন।

কবি নদীর সাথে ঘুরেফিরে প্রিয়তমা নারীর সাজুয্য অনুসন্ধানে মনোযোগী। কাব্যচর্চার শুরুর দিকে ‘কালের কলসে’র ‘বেহায়া সুরে’ তিনি বলেন, “তুমি আমার তিতাস, কালো জলের ধারা।” অতঃপর ‘সোনালি কাবিনে’ প্রিয়তমার মুখ স্মরণ করলেই নদী কবির বুকে জলের ঢেউ খেলে যায়।

“তোমার মুখ ভাবলে, এক নদী
বুকে আমার জলের ধারা তোলে।”

[‘এক নদী’, সোনালি কাবিন]

এই নদীকে শুধু তুলনা দিয়েই কবি ক্ষান্ত হননি, নদীকে নারীতে এবং নারীকে নদীতে একাকার করেন-

“নদীর ভিতরে যেন উষ্ণ এক নদী স্নান করে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 45
Website: https://tirj.org.in, Page No. 395 - 409
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তিতাসের স্বচ্ছজলে প্রক্ষালনে নেমেছে তিতাসই।"
['নদীর ভিতরে নদী', নদীর ভিতরে নদী]

কবি পৃথিবীর অনেক দেশ ঘুরে বহু সাগরের বেলাভূমি, সমস্ত স্নানঘর দেখেও সেই তিতাসে তাঁর প্রিয় নারীর স্নানের দৃশ্যের সাথে তুলনা পাননি কোথাও। তাই প্রিয় নদী আর প্রিয় নারী তার কাছে অভিন্ন। সে কারণে কবির মনে হয়েছে, এই নারীর অর্থাৎ সমস্ত নারীর ভেতর বয়ে চলেছে এক অচেনা নদী। আবার নদীকে কবির কখনো মনে হয়েছে 'আমাদের প্রাণ' অর্থাৎ বাঙালির সমাজ ও সংস্কৃতির প্রাণ প্রতীক এ নদী।

"নদী, নদী-
সন্তানের উল্লসিত আনন্দের মধ্যে আঙুল তুলে
যে স্পষ্ট জলধারা দেখালো, তা আমাদের প্রাণ।
এই সেই স্রোতস্বিনী, যার নকশায় আমাদের রমণীরা
শাড়ি বোনেন। ঐ সেই বাঁক যার অনুকরণে
আমার বোনেরা বঙ্কিম রেখায় এঁটে দেহ আবৃত করেন
দেখো সেই পুণ্যতোয়া
যার কলস্বর আমাদের সঙ্গীতে নিমজ্জিত করে।"
['স্বপ্নের সানুদেশ', সোনালি কাবিন]

কবি নদীকে বাঙালি জাতির সংস্কৃতির মূলে প্রতিস্থাপন করেন। এই নদীকে কেন্দ্র করে বাংলার বিশাল এক জনগোষ্ঠী জীবিকা নির্বাহ করে, দুই পাড়ের বিস্তীর্ণ ক্ষেতে ফসল ফলে, এর স্রোতের নকশায় নারীরা শাড়ি বোনেন এবং নদীর কুলুকুলু ঢেউয়ের স্বর সাঙ্গীতিক মুর্ছনায় আমাদের মুগ্ধ করে। অন্যদিকে কবি স্বপ্নের যে সানুদেশে শস্যের বীজ ছড়িয়ে দেবেন, তার বাম দিকে বয়ে যাবে রূপালি নদী। এক কথায়, কবির কাছে বাঙালি ঐতিহ্য, দৈনন্দিন জীবনাচরণ ও স্বাপ্নিক অভিপ্রায়ের সাথে এই নদীর সংযোগ ওতপ্রোত। একজন সমালোচকের মতে, "আল মাহমুদের অন্তর্জগতেই নদীকেন্দ্রী নৌকোময় গ্রামবাংলা প্রবেশ করে তাকে সম্পূর্ণ অধিকার করে আছে।"[১৫] সে কারণে নদী ও নদীকেন্দ্রিক জনপদের অর্থাৎ ভাটি বাংলার চিত্ররূপময় জীবন তাঁর কাব্যে প্রাণবন্ত।

আল মাহমুদের কবিতায় নদীর ভাঙন ও আগ্রাসন বিশেষত্বপূর্ণ। নদীবিধৌত বাংলাদেশে নদীর ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম জনপদের পর জনপদকে বিলীন করে দিয়ে হাজার হাজার মানুষকে করে তোলে নিঃস্ব, ভূমিহীন-উদ্বাস্তু।

"চড়ুয়ের বাসা, প্রেম, লতাপাতা, বইয়ের মলাট।
দুমড়ে মুচড়ে খসে পড়ে। মেঘনার জলের কামড়ে
কাঁপতে থাকে ফসলের আদিগন্ত সবুজ চিৎকার।
ভাসে ঘর, ঘড়া-কলসী, গরুর গোয়াল
ববুর স্নেহের মতো ডুবে যায় ফুলতোলা পুরোনো বালিশ
বাসস্থান অতঃপর অবশিষ্ট কিছুই থাকে না
জলপ্রিয় পাখিগুলো উড়ে উড়ে ঠোঁট থেকে মুছে ফেলে বাতাসের ফেনা।"
['বাতাসের ফেনা', সোনালি কাবিন]

নিঃস্ব-উন্মূল হয়ে নিরাপদে আশ্রয় নেয়া মানুষের সাধ জাগে নিজের গ্রামে ফিরে যাবার। কিন্তু মনে প্রশ্ন উঁকি দেয় নদী ভাঙা সেই গ্রাম ফিরে পাবে কি না-

"ফিরলে আজো পাবো কি সেই নদী
স্রোতের তোড়ে ভাঙা সে এক গ্রাম?
হায়রে নদী খেয়েছে সবকিছু

জলের ঢেউ ঢেকেছে নাম-ধাম।"
['এক নদী', সোনালি কাবিন]

সেই নদী জীবনের সবকিছুকেই গ্রাস করে নিয়েছে, এমনকি নাম-ধামও মুছে ফেলেছে। কবি সেজন্যে নদীর আগ্রাসনে উদ্বিগ্ন ও অসহায় বোধ করেছেন। পল্লীকবির মতো ছায়াঢাকা ঘন সুনিবিড় প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা করতে এই কবি দ্বিধান্বিত। কবি বরং নদী ভাঙনে ছিন্নমূল মানুষের করুণ পরিণতি অঙ্কনে সিদ্ধহস্ত। তাই কবির চোখ যখন অতীতাশ্রয়ী হয়, তখনই তাঁর মনে পড়ে যায় নিজেদের গ্রাম কীভাবে নদীর গর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে, কীভাবে নদীভাঙনে ছিন্নমূল পরিবার বসতভিটা ত্যাগ করে গ্রামান্তরে ছিটকে পড়ে আত্মীয় সজনের বাড়ি আশ্রয় নিয়েছে। সেই দুঃসহ স্মৃতি কবিকে আজীবন তাড়িত করে ফেরে।

একদিকে নদীর ধ্বংসযজ্ঞ, অন্যদিকে নদীর মৃত্যুতে কবি যুগপৎ ভাবে আলোড়িত। নদীর আগ্রাসন মানুষকে যেমন নিঃসম্বল করে, নদীর মৃত্যুতেও তেমনি সবুজ প্রান্তর ধূসর ও বালিময় হয়ে যায়। উভয়ই মানুষের জীবনধারণের জন্যে সমূহ ক্ষতি, অশনি সংকেত। নদীময় এদেশ যদি নদীহীন হয়ে যায় তাহলে দেশের ভবিষ্যৎ অস্তিত্ব নিয়েই প্রশ্ন দেখা দেবে, সেদিক বিবেচনা করেই কবি শঙ্কিত। কবি তাই 'নদীর মরণ' দেখে প্রিয়নারীকে 'জীবনের জল' হতে বলেন। বসনকে উদ্ভিদ ও অলঙ্কারকে শৈবাল হবার প্রত্যাশা করেন। কেননা নদীর মৃত্যুর সাথে সাথে নদীর সঙ্গে সম্পৃক্ত জনজীবন, জীবিকা, শস্যক্ষেত্র, নদীকেন্দ্রিক জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদেরও মৃত্যু ঘটে। কবি সেজন্যে নদীর নাম নিতে ও নদীকে স্বনামে ডাকতে দ্বিধাজীর্ণ-

"ইচ্ছার মৃত্যুর মতো পড়ে আছে জরাজীর্ণ যমুনার নাম
তোমাকে কী বলে ডাকি, করতোয়া? সস্তা লাগে বড়ো,
মাছের কঙ্কাল দেখে ও ললাটে জমেছে কি ঘাম?"
['খরা সনেটগুচ্ছ-১', দোয়েল ও দয়িতা]

কবি শুধু যমুনা ও করতোয়ার মৃত্যুতে শোকাহত নন, পদ্মার মরণেও একই সাথে ক্ষুব্ধ ও সোচ্চার। মানিক বন্দোপাধ্যায়ের (১৯০৮-৫৬) 'পদ্মা নদীর মাঝি' (১৯৩৬) উপন্যাসে চিত্রিত উত্তাল যৌবনবতী পদ্মা নদী কিংবা অদ্বৈত মল্ল বর্মনের (১৯১৪-৫১) 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এ বর্ণিত তিতাসকে কবি আর দেখতে পান না। কারণ ভারত সঞ্জীবনী পদ্মা নদীর উজানে 'ফারাক্কা বাঁধ' দিয়ে এর প্রবহমানতাকে রুদ্ধ করে দিয়েছে।[১৬] অথচ এই পদ্মা বা 'মা-গঙ্গা'র সাথে বৃহত্তর বাংলার প্রকৃতি, প্রাণবৈচিত্র, মানুষ, ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির যোগাযোগ সুনিবীড়। এই নদীর মরণে কবি উদ্বিগ্ন অর্থাৎ প্রকৃতির ধ্বংসযজ্ঞের বিরুদ্ধে সোচ্চার।

"কখনো ডেকেছি যারে যমুনা, জাহ্নবী, সদানীরা
মানুষের ধর্মে কর্মে, রূপকে, গাথায় চলমান
হে পদ্মা প্রলঙ্করী, কীর্তিনাশা, ভৈরবী সুন্দরী;
এখন সে নিদ্রা যায় শামুকের খোলের ভিতর,
যেন এক অজগরী মন্ত্রবলে হয়ে গেছে দড়ি,
যারে নিয়ে মজা করে গুটি কয় ব্রাহ্মণ ইতর।"
['খরা সনেটগুচ্ছ-৫', দোয়েল ও দয়িতা]

যে পদ্মা বহু নামে খ্যাত, সেই পদ্মার খুনীদের প্রতি কবি প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত। কেননা এই নদীকে কেন্দ্র করেই মানুষ জীবন-জীবিকা নির্বাহ করে। নদীর মরণে মানুষের অস্তিত্বের সংকটে তাই কবি মর্মাহত। মহাভারতের 'অন্যায় পাহারা' ছিন্নকারী জহ্নুমুনিকে[১৭] আহ্বান করেন এই নদীর প্রবাহ ফিরিয়ে দেবার জন্যে। যে নদীর গর্জন শুনে প্রাণ ফিরে পাবে এ দেশের বিরাণ অঞ্চল, এবং খরার ফাটল বেয়ে সকলের কাঙ্ক্ষিক্ষত জল পুনরায় নেমে আসবে- জীবন ও প্রকৃতি হয়ে উঠবে প্রাণ-চাঞ্চল্যে গতিশীল ও উর্বর। এইভাবে আল মাহমুদ কবিতায় নদীকে বিচিত্রভাবে উপস্থাপন করেন। এ-দেশে বিরাজমান

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 45
Website: https://tirj.org.in, Page No. 395 - 409
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

প্রাণ-প্রবাহ, প্রাণ-বৈচিত্র্য, জীবন-জীবিকার নির্ভরতা, লৌকিক সংস্কৃতি ও সৌন্দর্যের কেন্দ্রে রয়েছে নদী। এই নদীর সামগ্রিক রূপকল্প নির্মাণে আল মাহমুদ দায়বদ্ধতা ও শিল্প কুশলতার পরিচয় দেন।

৪

বৃষ্টির জলের সাথে পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব, প্রকাশ ও বিকাশের সম্পর্ক একই সূত্রে আবদ্ধ। জীবন-সন্ধানী কবি মাত্রই বৃষ্টির কার্যকারিতা ও সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট। আল মাহমুদের কবিতায় বৃষ্টির কার্যকারণ আগাগোড়া গুরুত্ব পেয়েছে। 'লোক লোকান্তরে' কবি 'বৃষ্টির অভাবে' জীবনের সজীবতার প্রতীক 'চালের লতানো ফুল' মরে যাবার জন্যে শঙ্কিত এবং শুষ্ক দেশে কীভাবে প্রিয় নারী সন্তান প্রসব করবে সে বিষয়ে কবি চিন্তিত। তবে 'কালের কলসে', 'প্রথম বৃষ্টির' ধারায় কবি আনন্দিত। ফাগুনের প্রথমে আকাশে সাহসী দৈত্যের মতো মেঘের আসর কবির শহরে নেমে আসলে সকলে আনন্দে উদ্বেল হয়ে নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে প্রথম বৃষ্টির গন্ধ অনুভব করে। প্রথম পানির ফোঁটায় ঘাস, নদীর জল কেঁপে ওঠে, উলঙ্গ ছেলের দল জলের কাদায় মাতামাতি করতে থাকে। তাই হঠাৎ বৃষ্টির আগমনে প্রকৃতির সবকিছু প্রাণবন্ত হয়ে যায়।

"অকস্মাৎ বৃষ্টি পেয়ে মত্ত হলো সমস্ত অঞ্চল
কড়ির খেলায় বসে মেয়েরাও জুড়লো কাড়াকাড়ি।"
['প্রথম বৃষ্টির', কালের কলস]

বৃষ্টিধারায় একদিকে প্রকৃতিতে চাঞ্চল্য, অন্যদিকে লোকজীবনেও আনন্দ আসে, সেই সত্যই কবি ব্যক্ত করেন।

'সোনালি কাবিনে' কবি 'আঘ্রাণ' কবিতায় হেমন্তের বৃষ্টির সাথে প্রিয় মানবীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। এই বৃষ্টিতে কবি মানুষীর গন্ধ অনুভবে আকুল। কবি জলদ হাওয়ায়, জলের ঢেউয়ে এবং দু'হাতের কোষের জলে সেই নারীর সঞ্চরণ মনে করে তার 'আতর' ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে গ্রহণ করেন। আর সে জন্যেই 'বায়ু', 'বরুণ' ও 'পর্জন্য দেবতা'র উদ্দেশে কবির আর্তি:

"হে বায়ু, বরুণ, হে পর্জন্য দেবতা
তোমাদের অবিরল বর্ষণে ঘর্ষণে
যখন পর্বত নড়ে, পৃথিবীর চামড়া খসে যায়
তবু কেন রমণীর নুন, কাম, কুয়াশার
প্রাকৃতিক গন্ধ লেগে থাকে? হে বরুণ, বৃষ্টির দেবতা!"
['আঘ্রাণ', সোনালি কাবিন]

পৌরাণিক মতে 'বরুণ' হল সমুদ্রের অধিপতি বা জলের দেবতা এবং 'পর্জন্য দেবতা' গর্জনকারী জলবর্ষী মেঘের বা ইন্দ্রের দেবতা। কবি প্রিয়ার ঘ্রাণের উৎসানুসন্ধানে বৃষ্টি ও মেঘের দেবতাদের এবং বায়ুর স্মরণাপন্ন হয়েছেন। এতে কবি একদিকে মানবীর ঘ্রাণের খোঁজে চঞ্চল; অন্যদিকে বৃষ্টির উৎসের কাছে জিজ্ঞাসায় ব্যাকুল। বৃষ্টিকে ঘিরে কবির এক বিশেষ দার্শনিক সত্যে উপনীত হবার প্রচেষ্টা- পৃথিবী তথা মানুষের আদি উৎসের অনুসন্ধানে কবি সন্ধিৎসু।

ষাটোর্ধব বয়সে প্রকাশিত 'নদীর ভিতরে নদী' (২০০১) কাব্যগ্রন্থের 'বৃষ্টি' কবিতায় আল মাহমুদের ব্যক্তিগত অনুভবে বৃষ্টির সঙ্গে সৃষ্টির সম্বন্ধের কথা মনে আসে। কবির মনে হয়; 'বৃষ্টি মানেই মনে মনে জায়গা বদল করে অন্য কোথাও যাওয়া'। প্রবল বর্ষণে যখন জমিন ভিজতে থাকে তখন কবির মাঝে সৃজনের সংগুপ্ত বীজ একসাথে অঙ্কুরিত হবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে যায়। দৃষ্টি ও স্পর্শের অনুভূতি ক্ষয়ে গেলেও কবি বৃষ্টির সময় অনুভব করেন - 'কাঁচা মাটির উঠোনে সেই উদোম, উদ্ভিন্নযৌবনা এক পৃথিবী'। এক কথায়, কবি বৃষ্টির জলের সঙ্গে প্রকৃতির মাঝে প্রাণের সৃজন-আনন্দ উপলব্ধি করেন।

বৃষ্টি ভাবনায় কবি চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছেন 'বিরামপুরের যাত্রী'র 'বৃষ্টির বিজয়' কবিতায়। এ কবিতায় কবি বৃষ্টির বিজয় গাঁথা উচ্চারণ করেন। আষাঢ়ের বর্ষণরত রাতে বৃষ্টির বিবরণকে কবির মনে হয়েছে 'পৃথিবীর উদ্ভবের গান'। চারপাশে রহস্যের বীজ ফাটার অনুভবে কবির প্রাণ কাঁপতে থাকে। কবি বুঝতে পারেন অঙ্কুরের মুখ স্পর্শ

করে বৃষ্টি ও জলজ বাতাস। পৃথিবীর আদিম এই ধারা হাজার হাজার বছর ধরে মাটিকে সিক্ত করে তোলে অঙ্কুরোদগমের জন্যে। কবির ভাষায় -

"বৃষ্টি তবে সৃষ্টির রোদন মাত্র- আর কিছু নয়।
চাই শুধু সিক্ত হওয়া, ভিজে গিয়ে কাদা হয়ে যাওয়া
তবেই উত্থিত হয় প্রকৃতির ভেতরে পুরুষ,"
['বৃষ্টির বিজয়', বিরামপুরের যাত্রী]

আদিম এই জলধারায় প্রকৃতিতে সৃষ্টির প্রকাশ, বিকাশ ও উৎসব সম্পন্ন হয়। কবি এই বৃষ্টিকে শুধুমাত্র 'বৃষ্টির রোদন' বলতে ইচ্ছুক; সেই রোদনে প্রকৃতিতে সৃষ্টির পুরুষ জন্মের আয়োজন শেষ করে থাকে। সে জন্যে কবির ঘোষণা -

"পানির প্রভুত্বে হাসে পৃথিবীর প্রাণের সঞ্চয়
বলে জয়, জয়, জয়, জলময় বৃষ্টির বিজয়।"
['বৃষ্টির বিজয়', বিরামপুরের যাত্রী]

বৃষ্টির এমন ক্ষমতা যে তা কোনো বাধা মানে না, শুষ্ক জমিন সিক্ত ও প্রাণের সঞ্চার করে এবং সজীবতা ও সবুজের উদ্ভব সম্ভব করে তোলে। জড়, প্রাণহীনতা ও অজন্মার মধ্যে প্রাণের বিজয় ঘোষণা করে। নিজের সৃষ্টিশীল সত্তার সঙ্গে বৃষ্টির সাদৃশ্য উপলব্ধি করে কবি বৃষ্টির আধিপত্য কামনা করেছেন।

আল মাহমুদের প্রকৃতিকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ও শিল্পশৈলীর প্রবণতাকে এভাবে দাঁড় করানো যায় -

ক. প্রথম পর্যায়ের কবিতায় প্রকৃতি সম্বন্ধে কবির নান্দনিক-দার্শনিক মনোভাবের প্রাধান্য লক্ষণীয়।
খ. প্রকৃতি বাঙালির জীবনে প্রবলভাবে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত।
গ. প্রকৃতি ও নারীকে অভিন্ন কল্পনা এবং শেষ পর্যন্ত দেশজননী হিসেবে কবি প্রকৃতিকে উপস্থাপন করেন।
ঘ. নগরজীবন থেকে প্রত্যাবর্তনের জায়গারূপে কবি প্রকৃতিময় গ্রামসভ্যতাকে নির্বাচন করেন।
ঙ. প্রকৃতি বাঙালি জীবনের উৎপাদন ব্যবস্থা, জীবিকা, প্রাণবৈচিত্র, সাংস্কৃতিক দিক নির্ণয়ের সঙ্গে জড়িত।
চ. প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান- জমিন, নদী ও বৃষ্টিকে জনজীবন, নন্দন, দর্শন, নারী, কল্পনা, আবাদ-বিবাদ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্ররূপে কবি দেখেছেন।

উপসংহার : আল মাহমুদ প্রকৃতির সামগ্রিক বোধ নিজের মাঝে ধারণ করে আপন শিল্পশৈলীতে প্রকাশ করেন। বাংলা কবিতায় প্রকৃতিকেন্দ্রিক নান্দনিক ভাবনা থেকে বেরিয়ে এসে বাস্তব ও কৃষক জীবনলগ্ন করে তোলেন এবং প্রাকৃতিক বিভিন্ন উপাদানের মাধ্যমে প্রকৃতিকে নিজস্ব ভাবনায় উপস্থাপন করেন। আবহমান বাংলার জনজীবনের স্বপ্ন, বাস্তবতা, সংগ্রাম ও সংস্কৃতির কেন্দ্রে কবি প্রকৃতিকে স্থাপন করেন মৌলিক চিন্তাস্রোতে।

Reference:

১. ইমাম, মুহাম্মদ হাসান, ইমাম, 'প্রকৃতি : সদরে-অন্দরে', শহীদ ইকবাল (সম্পা.), চিহ্ন (রাজশাহী: চিহ্ন, আগস্ট ২০০৯), পৃ. ৬৪-৬৫
২. বসু, বুদ্ধদেব, কালের পুতুল (৩য় সং; কলকাতা: নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা.লি., ১৯৯৭), পৃ. ২৭-২৮
৩. জাহাঙ্গীর, বোরহানউদ্দিন খান, দেশজ আধুনিকতা: সুলতানের কাজ (ঢাকা: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৯৯), পৃ. ৫৫-৫৬
৪. মাহমুদ, আল, 'আমি ও আমার কবিতা', উপমা, আল মাহমুদ সংখ্যা (চট্টগ্রাম, ১৯৯৪), পৃ. ৫
৫. কবির, হুমায়ুন, বাংলার কাব্য (২য় সং; কলকাতা: চতুরঙ্গ, ১৩৬৫), পৃ. ৩১
৬. মাহমুদ, আল, সাজ্জাদ বিপ্লব (সম্পা.), আল মাহমুদ : সাক্ষাৎকার (ঢাকা: ঐতিহ্য, ২০০৩), পৃ. ২৭-২৮

৭. চৌধুরী, বেলাল, 'সাপ্তাহিক বিচিত্রা' (ঢাকা, ১৯৭৬), দ্র. সাজ্জাদ বিপ্লব (সম্পা.), স্বল্পদৈর্ঘ্য, আল মাহমুদ সংখ্যা-২ (বগুড়া: ২০০২), পৃ. ১৭৬-৭৭

৮. আল মাহমুদের সমগ্র কাব্যকে তিনটি পর্বে বা পর্যায়ে ভাগ করা যায়, যথা:

প্রথম পর্যায় : 'লোক লোকান্তর' থেকে 'সোনালি কাবিন' (১৯৬৩-৭৩)

দ্বিতীয় পর্যায় : 'মায়াবী পর্দা দুলে ওঠো' থেকে 'দোয়েল ও দয়িতা' (১৯৭৬-৯৬)

তৃতীয় পর্যায় : 'দ্বিতীয় ভাঙন' থেকে 'পাখির কথায় পাখা মেললাম' (২০০০-২০১২)

৯. ইসলাম, মুস্তাফা নূরউল, 'বাংলাদেশ : প্রসঙ্গ উত্তরাধিকার', মুস্তফা নূরউল ইসলাম (সম্পা.), বাংলাদেশ: বাঙালী, আত্মপরিচয়ের সন্ধানে (ঢাকা: সাগর পাবলিশার্স, ১৯৯০), পৃ. ৬৯

১০. জাহাঙ্গীর, বোরহানউদ্দিন খান, দেশজ আধুনিকতা: সুলতানের কাজ, পৃ. ৫৩

১১. বসু, রাম, 'পরিচয়' (কলকাতা, পৌষ-মাঘ, ১৯৭৮), দ্র. উপমা, পৃ. ১৮৭

১২. হোসেন, খোন্দকার আশরাফ, বাংলাদেশের কবিতা: অন্তরঙ্গ অবলোকন (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪), পৃ. ২৯-৩০

১৩. আহসান, সৈয়দ আলী, 'আল মাহমুদ', উপমা, পৃ. ১৮৯

১৪. মাহমুদ, আল, "তিতাস", 'লোক লোকান্তর', কবিতাসমগ্র ১ (ঢাকা: অনন্যা, ১৯৯৭), পৃ. ২৯

১৫. সৈয়দ, আবদুল মান্নান, 'আল মাহমুদের সাম্প্রতিক কবিতা', উপমা, পৃ. ৬৯

১৬. দ্র. রহমান, সরদার আবদুর, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ (রাজশাহী: পরিলেখ, ২০০৬), পৃ. ৮-১৭

১৭. দ্র. বন্দ্যোপাধ্যায়, অমলকুমার, পৌরাণিকা, প্রথম খণ্ড (২য় সং, কলিকাতা: ফার্মা কে এল এম প্রা.লি., ১৯৮৫), পৃ. ২২১-২২৫